Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

March, 2016

GI Journal No. 01

Published on: 04 AUG 2016

Issued under the directions of the Registrar, Department of Patents, Designs and Trade Marks, Dhaka, Bangladesh.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধণের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১)-এ এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি. আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালী পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন করপোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবী, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ ।

৭। কনভেশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি পত্রায়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-০১

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক অবেদনকৃত আবেদন নং-১ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "জামদানি শাড়ী" যা শ্রেণী ২৫-তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

আবেদনকারী ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।

ঠিকানা ঃ ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ভৌগোলিক নির্দেশক ঃ জামদানি শাড়ী।

শ্রেণী ঃ ২৫ (বস্ত্র)

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

খ) ঠিকানা ঃ ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ প্রয়োজন অনুসারে প্রদান করা হবে।

ঘ) প্রকার ঃ ২ (দুই) প্রকার-১টি রেশম সূতা দ্বারা তৈরী। আর অন্যটি সূতী সূতা দ্বারা তৈরী।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ জামদানি শাড়ীর বিশেষত্বই হচ্ছে-

১. এটি সম্পূর্ণ হাতে বুনা হয় ;

২. শীতলক্ষ্যা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার জলবায়ু জামদানি শাড়ী বুনার উপযোগী ;

৩. শীতলক্ষ্যা নদীর পানির সাথে রঙ মিশিয়ে সূতা রঙ্গিন করা হয়, যার ফলে রঙয়ের স্থায়িত্বও বেশী হয় ;

৪. শাড়ীর ডিজাইনও হাতে বুনা হয় যার ফলে দুই পাশ থেকেই ডিজাইন সমানভাবে লক্ষণীয় ।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ জামদানি শাড়ী।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র। প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙ্গালি নারীদের অতি পরিচিত। মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি বলতে সাধারণতঃ শাড়িকেই বোঝান হয়। তবে জামদানি কাপড় থেকে ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হত। ১৭০০ শতাব্দীতে জামদানি দিয়ে নকশাওয়ালা শেরওয়ানির প্রচলন ছিল। এছাড়া, মুঘল আমলে নেপালের আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্যও জামদানি কাপড় ব্যবহৃত হত।

জামদানি নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ রয়েছে। একটি মত অনুসারে 'জামদানি' শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। ফার্সি জামা অর্থ কাপড় এবং দানা অর্থ বুটি, সে অর্থে জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। এ কারণে মনে করা হয় মুসলমানেরাই ভারত উপমহাদেশে জামদানির প্রচলন ও বিস্তার করেন। আরেকটি মতে, ফারসিতে জাম অর্থ এক ধরনের উৎকৃষ্ট মদ এবং দানি অর্থ পেয়ালা। জাম পরিবেশনকারী ইরানী সাকীর পরনের মসলিন থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি ঘটেছে।

জামদানির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টাব্দে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে, পেরিপ্লাস অব দ্যা এরিথ্রিয়ান সি বইতে এবং বিভিন্ন আরব, চীন ও ইতালীর পর্যটক ও ব্যসায়ীর বর্ণনামে। কৌটিল্যের বইতে বঙ্গ ও পুন্ড্র এলাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, যার মধ্যে ছিল ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসী। নবম শতাব্দীতে আরব ভূগোলবিদ সোলায়মান তার গ্রন্থ স্ত্রিল সিলাইতওয়ারিখে উতরুমি নামের রাজ্যে সূক্ষ্ম সুতি কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সোনারাগাঁও এলাকাস্থিত সুতিবস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলও ঢাকার মসলিনের প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক টেলর লিখেছেন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১০ হাত × ২ হাত পরিমাপের ও ৫ শিক্কা ওজনের এক খন্ড আব-ই-রওয়ান এর মূল্য ছিল ৪০০ টাকা। অপর দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য তৈরি জামদানি বা নক্সাযুক্ত ঢাকাই মসলিনের মূল্য ছিল ৪৫০ টাকা।

ঐতিহাসিক বর্ণনা, শ্লোক প্রভৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় দুকূল বস্ত্র থেকে মসলিন এবং মসলিনে নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হত। মূলতঃ বাংলাদেশের ঢাকা জেলাতেই মসলিন চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। বৃহত্তর ঢাকা জেলার সোনরাগাঁও, ধামরাই, তিতাবাড়ি, বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি এলাকা মসলিনের জন্য সুবিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয়, ইরানী, আর্মেনিয়ান, মুগল, পাঠান বণিকেরা মসলিন ও জামদানি ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানেরাও এই শিল্প বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন। ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ বলা হয় মুঘল আমলকে। এ সময় দেশে-বিদেশে মসলিন ও জামদানির চাহিদা বাড়তে থাকে এবং এ শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি ও সাধিত হয়। আঠারো শতকে ইংরেজ দলিল থেকে জানা যায় মলমল খাস ও সরকারআলি-ই-নামের মসলিন সংগ্রহ করার জন্য দারোগামলমল-ই-পদবীর উচ্চ পর্যায়ের রাজ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিটি তাঁতখানায় একটি দপ্তর ছিল এবং এখানে দক্ষ তাঁতি, নারদিয়া, রিপুকার প্রভৃতি কারিগরদের নিবন্ধন করে রাখা হত। দারোগার প্রধান কাজ ছিল মসলিন ও জামদানি তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপে লক্ষ্য রাখা। তৎকালীন সময়ে ঢাকা থেকে প্রায় একলক্ষ টাকা মূল্যমানের মলমলখাস মোঘল দরবারে রপ্তানি করা হত। বাংলার নবাব ও জগৎশেঠের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার জামদানি কেনা হয়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। এদের নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের স্বার্থে তাঁতীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। তাঁতীরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে রাজী না হলে তাদের মারধোর করা হতো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিনের এক হিসেব থেকে দেখা যায় সাদা জমিনে ফুল করা কাজের ৫০,০০০ টাকার জামদানি দিল্লী, লক্ষ্মৌ, নেপাল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকার নবাবরা ব্যবহার করতেন। এই শিল্প সংকুচিত হওয়ার পেছনে কিছু কারণ ছিল, যার মধ্যে প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এর ফলে বস্ত্র শিল্পে যন্ত্রের আগমন ঘটে এবং কম মূল্যে ছাপার কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া দেশী সূতার চেয়ে তখন বিলেতি সূতার দাম কম ছিল। তৎকালীন মোঘল সম্রাট ও তাদের রাজ কর্মচারীরা এ শিল্পের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে ঢাকার ডেমরায় জামদানি পল্লীর তাঁতীদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। বর্তমানে ঢাকার মিরপুরে জামদানি পল্লী স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জামদানির চাহিদা এখনও রয়েছে। বর্তমান বাজারে জামদানির উচ্চমূল্য ও বিপুল চাহিদার কারণে বাংলাদেশের এই শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। ১৯৯৩ সালে জামদানি শিল্পের প্রসারের জন্য ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব পৌরসভার নোয়াপাড়া গ্রামে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর তত্ত্বাবধানে ২০ একর জমির উপর একটি জামদানি নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

জামদানি শাড়ী অনেক প্রকার হয় তবে প্রাথমিকভাবে জামদানী শাড়ীর উপাদান অনুযায়ী এটি চার প্রকার ঃ

০১। (রেশম সুতা) সিল্কের (আড়াআড়ি সুতা) ও বাইনের সুতা (লম্বালম্বি সুতা) টানার সুতা-ফুল সিল্ক জামদানী ডিজাইন কটনের।

০২। হাফ সিল্ক জামদানী-যার টানার সুতাগুলো হয় কটনের (লম্বালম্বি) আর বাইনের সুতাগুলো হয় রেশমের (আড়াআড়ি) ডিজাইন কটনের।

০৩। সম্পূর্ণ কটন সুতায় তৈরি। যা-ফুট কটন জামদানি।

০৪। কটন ডিজাইন (আড়াআড়ি সুতা) নাইলনের ও বাইনের সুতা (লম্বালম্বি সুতা) টানার সুতা-নাইলন জামদানী, নাইলনের/কটনের।

আবার জামদানীর নকশার প্যাটার্নের উপর বা নকশার ধরনের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু শ্রেণীবিন্যাস করা আছে। যেমন-

তেরছা ঃ যে জামদানীর নকশায় তির্যক রেখায় সাজানো থাকে তাকে তেরছা নকশার জামদানী বলে।

বুটিদার ঃ সাধারণত ছোট ছোট ফুলের নকশা দেখা যায়, যখন পুরো জমিন জুড়ে ফুল বা ফুলের ছড়ার নকশা করা হয় তখন তাকে বুটিদার জামদানী বলে।

ঝালর ঃ যখন ফুলের নকশা জালের মত পুরো জমিনে বিস্তৃত থাকে তখন তাকে ঝালর জামদানী বলে।

পান্না হাজার ঃ পান্না হাজার হচ্ছে যখন নকশার ফুলগুলো জোরা দেয়া থাকে অলংকারের মনির মত।

ফুলওয়ার ঃ যখন পুরো জমিনে টানা ফুলের নকশা করা থাকে তখন তাকে ফুলওয়ার বলে।

তোরদার ঃ তোরদার জামদানী হচ্ছে বড় আকারের বাস্তবানুগ ফুলের নকশার জামদানী।

অন্যান্য নকশা তোলা বস্ত্রে যে নাম ব্যবহার করা হয় জামদানিতেও সেই সকল নাম প্রচলিত আছে।

জামদানী শাড়ীর স্যান্ডার্ড মাপ-

দৈর্ঘ্য ফুট ১৮ -

প্রস্থ ফুট ৪ -

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের এলাকা এবং মানচিত্র ঃ বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে জামদানি উৎপাদিত হয়। তবে বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের নারায়ণগঞ্জ জেলার অধীন রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানা জামদানি শাড়ী উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের এলাকার মানচিত্র জার্নালের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি) ঃ

জামদানি বৃহত্তম ঢাকা অঞ্চলের একটি প্রাচীন কারুশিল্প। তবে এটি ঐতিহ্যবাহী মসলিনের প্রকারভেদ বা একটি প্রজাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বর্তমানে জামদানি একটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শিল্প ও আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পণ্য। ঢাকা অঞ্চলের জামদানির বয়স ৪০০ বছরেরও বেশি। জামদানির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে শীতলক্ষ্যা নদীও। এ নদীর অববাহিকার পার্শ্ববর্তী মানুষের শিল্পভাবনার বহিঃপ্রকাশ জামদানি। এটা কোন আরোপিত শিল্প কর্ম নয়। জামদানি যে বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য পৃথিবীতে তার বহু তথ্য প্রমাণও রয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেরই নিজস্ব প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে ও ভূ-খন্ডের মানুষের শিল্প বোধ, রুচি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তার পোশাক, খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য তৈরি হয়ে থাকে। এক সময় ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় উৎপন্ন কার্পাস দিয়ে তৈরি হতো 'মসলিন' নামে সুক্ষ্ম মিহি বস্ত্র। অপরদিকে বিচিত্র কারুকার্যময়, ফুলতোলা রঙিন সুতিবস্ত্র, যেগুলোতে নকশা করা হতো তা পরিচিত ছিল 'জামদানি' নামে। ডিজাইন, উৎপাদন পদ্ধতি, কারিগরদের শ্রেণি ও সংখ্যা, সুতার কাউন্ট ও নকশা বৈচিত্রের কারণে জামদানি একটি আলাদা শিল্প মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে ঢাকার সন্নিকটে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও অঞ্চলে এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে। ঢাকা অঞ্চলের তাঁতীরা হিন্দু (যোগী) ও মুসলমান (জোলা) এ দুটি সম্প্রদায়ের লোক হলেও জামদানি কারিগরেরা সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক।

প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিকতা ও বিবর্তন ঃ

প্রাচীন মসলিন শিল্পের উত্তরসূরী হিসেবে এ অঞ্চলে 'জামদানি' শিল্পের বিকাশের ইতিহাসও প্রাচীন। এ উভয় শিল্পের কাঁচামাল সংগৃহীত হতো ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট শ্রেণির কার্পাস তুলা থেকে। ঢাকা সন্নিকটে 'কাপাসিয়া' নামক জায়গাটি এই প্রাচীন কার্পাসের স্মারক হিসেবে এখনও অস্তিত্বমান। এতদঞ্চলের কার্পাস তুলায় তৈরি চিকন সুতায় তৈরি সুক্ষ্ম বস্ত্রের [যা ইতিহাসে মসলিন নামে খ্যাত] কথা গ্রিক ঐতিহাসিক হেরিডটাস কার্পাস থেকে সুতীবস্ত্র উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। মৌর্য আমলে [খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক] গুপ্ত আমলে [খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক] এ অঞ্চলে কার্পাস উৎপাদন ও সুক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের প্রসার ঘটতে শুরু করে। গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্র গুপ্তের আমলে এ অঞ্চলে তৈরি ফুল তোলা রঙিন বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যা মূলত জামদানির-ই নামান্তর। কৌটল্যের অর্থ শাস্ত্রে কার্পাস থেকে তৈরি সুক্ষ্ম বস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। তাছাড়া স্ট্রাবো [প্রথম শতাব্দী] এরিয়েন [দ্বিতীয় শতাব্দী] প্রমুখ লেখকগণ প্রাচীন রোম ও মিশরে সুক্ষ্ম বস্ত্র রপ্তানির কথা উল্লেখ করেছেন। নবম শতকে আরবীয় ভৌগোলিক সোলায়মান এখানে অভূতপূর্ব সুক্ষ্ম বস্ত্রের উৎপাদনের কথা বলেছেন। চতুর্দশ শতকে মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ের সুতীবস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পঞ্চদশ শতকের চীনা ভ্রমণকারীও লেখকদের বর্ণনায় অন্যান্য সুক্ষ্ম বস্ত্রের সাথে 'পিপো' নামক যে রঙিন নকশাযুক্ত কাপড়ের কথা উল্লেখ করেছেন তা আধুনিক জামদানির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সোনারগাঁও অঞ্চলে সুতীবস্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে সুলতানি ও আফগান আমলে। ঐতিহাসিক তথ্য মতে, সোনারগাঁওয়ের মুসলমান শাসকরা মুসলিম তাঁতীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যে কারণে জামদানি শিল্পের কারিগরদের অধিকাংশই মুসলমান। পাঠান শাসকেরা অনেক পারস্য দেশীয় কারিগরকে বাংলায় নিয়ে আসেন এবং একাংশ সোনারগাঁও বসতি স্থাপন করে। যে কারণে জামদানি শিল্পের নকশার ক্ষেত্রে পারস্যের প্রভাব স্পষ্ট। জামদানি শাড়িতে ফুল ও লতাপাতার মটিফ পারস্য প্রভাবযুক্ত নকশা বিশেষ। তাছাড়া 'জামদানি' নামটিও ফার্সি 'জাম' শব্দ থেকে এসেছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, মসলিনের উত্তরসুরী হিসেবে 'জামদানি' শিল্পটি একটি ভিন্নমাত্রার শিল্প হিসেবে আলাদাভাবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে সুলতানি আমল থেকে।

মোঘল আমলে ঐতিহাসিক আবুল ফজল, পর্তুগিজ পর্যটক বারবোসা প্রমুখেরা সোনারগাঁও অঞ্চলে যে সুক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বুটিক তোলা মসলিন জামদানি কাপড়ও ছিল। মোগল আমলে জামদানি সম্পর্কে জানা যায় যে, তখন ঢাকা কারখানার অধীনস্থ কারখানাগুলোতে জামদানি তৈরি হত। বর্তমানে সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ এলাকা পূর্বে ঢাকা আড়ং এর অধীনে ছিল। তাছাড়া ঢাকা শহরে জামদানি তৈরি হত তাঁতিবাজার, কলতাবাজার ও নিকটস্থ ডেমরা এবং ধামরাই অঞ্চলে। মোগল যুগে ঢাকা ফ্যাক্টরির তাঁতিরা দারোগাদের মাধ্য দাদন পেত। ঐতিহাসিকরা শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকার এ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে মোগল ও রাজদরবারে জামদানি তখন রাজকীয় পোশাকে ব্যবহৃত হত। মুর্শিদাবাদের নবাব রাজ দরবারেও জামদানির কদর ছিল। প্রাদেশিক নবাবরা দিল্লির দরবারে উপঢৌকন হিসেবে অন্যান্য বস্ত্রের সাথে জামদানিও পাঠাতেন। তাছাড়া আরব ও পারস্য দেশেও মসলিনের মতো বুটিতোলা জামদানির চাহিদা ছিল। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য প্রেরিত জামদানির মূল্য ছিল ৩১ পাউন্ড। বাংলার নায়েবে নাজিম রেজা খান প্রতিটি জামদানি ক্রয় করতো ৪৫০ টাকায়। নবাব জাফর আলী খানও আওরঙ্গজেবকে ঢাকার জামদানি দ্বারা নজরানা দিতেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নীল রং দিয়ে রাঙানো কারুকার্যের জামদানি পছন্দ করতেন। মোগল যুগের বাঙালি কবিও জামদানির কথা কবিতায় উল্লেখ করেছেন। প্রাদেশিক শাসকের শেষের দিকে নবাব মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে মোগল সম্রাটের জন্য ২৫০ টাকা রুপি দামের ১০০ খানা জামদানি প্রেরণ করেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয় বণিকরা এখানে কুঠি স্থাপন করে সুতিবস্ত্রের ব্যবসা করতো। টেলরের মতে 'ছাপ্পা জামদানি' নামক এক প্রকার কর দিতে তাঁতিরা জামদানি তৈরি করে বিদেশি বণিকদের কাছে দালালদের মাধ্যমে বিক্রি করার অনুমতি পেত। অন্যদিকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিদেশে জামদানির চাহিদা ছিল ব্যাপক। তবে ১৭৭০ সালের মহা দুর্ভিক্ষে এখনকার তাঁত শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উনিশ শতকের গোড়াতে জামদানি কারিগরদের কোম্পানীর লোকেরা দাদন দেয়া বন্ধ করে বোর্ড অব ট্রেডকে লেখা ১৮১৬ সালের তাঁতিদের এক চিঠিতে জানা যায়। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব এদেশীয় বস্ত্র শিল্প, বিশেষত মসলিনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ১৮২৪ সালে বিলেতি কলের সুতা আমদানির পর দেশীয় কার্পাস তুলার চাষ নিরুৎসাহিত হয়। ফলে অপেক্ষাকৃত কম দামে কলের সুতার জামদানি তৈরি হতে থাকে। ১৮৩০ সালে হাতে তৈরি জামদানিও কলে তৈরি জামদানির মূল্যের মধ্যে তারতম্য ছিল উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ শিল্পনীতি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন মসলিন শিল্পকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে স্থানীয় তাঁতিরা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে মসলিনের পরিবর্তে জামদানি তৈরিতে মনোনিবেশ করে। শিল্পটি স্থানীয় চাহিদা, দেশি-বিদেশি অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এখনও টিকে আছে। ১৯০৩ সালে ঢাকায় তৈরি জামদানি দিল্লি প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান দখল করে। ১৯০৭ সালে ত্রিপুরার রাজ পরিবার ২০০ টাকা মূল্যের জামদানি সংগ্রহ করেছিল। হাতে কাটা সুতায় তৈরি পুরনো আমলের জামদানি বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে উনিশ শতকের দু'খানা জামদানির মধ্যে একখানা সুতি জামদানি, যার আঁচলে কনকা ও জমিনে তেরসী নকশা তোলা। অপর খানা হাফ সিল্ক, যা রূপার সুতায় বোনা ও অলংকরণ আছে।

মোগল সম্রাট ও প্রাদেশিক মোগল গভর্নরগণ ছাড়াও উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার স্থানীয় নবাব পরিবার জামদানি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। বিশেষত নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং তার স্ত্রী জানাত আরা বেগম এ ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী। জানাত আরা জরিদার ও জামদানিতে কালো ও লাল রঙ-এর নকশার বহুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাটিক, ফুল তোলা বিভিন্ন রঙিন জামদানি উদ্ভাবনে অবদান রাখেন। তিনি সুতা ও সিল্ক যৌগ মিশ্রিত জামদানি তৈরির কৌশল ও ধারণা দেন।

ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্যনীতি বাংলা তথা ঢাকা অঞ্চলের তাঁত শিল্পকে বিনাশের মুখে ঠেলে দিলেও এখানকার তাঁতিরা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে এখনও জামদানি শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আছে। জামদানি উৎপাদন পূর্বের অনেক এলাকায় যেমন হ্রাস পেয়েছে আবার নতুন কিছু এলাকায় এ শিল্পের প্রসারও ঘটেছে। তবে এখনও ঢাকার সন্নিকটে রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও অঞ্চল এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমাদের জন্য এটি আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, "ইউনেস্কো" (UNESCO) ২০১৩ সালে জামদানিকে "ইনটেনজিবল হেরিটেজ অব বাংলাদেশ" হিসাবে ঘোষণা করেছে। জামদানি যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য ইউনেস্কো ঘোষণা তারই স্বীকৃতি।

ঞ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ

তাঁত বুননের কৌশল ও প্রক্রিয়া

জামদানি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় বাইনের সুতা আর তানার সুতার মোড়া রঙ করণের মধ্য দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যেই খাদার ভেতরের গরম রঙে হাজার হাজার মোড়া সুতা রঙিন হয়ে উঠে। সুতার মোড়া রোদে শুকিয়ে পাঠানো হয় ভাতানোর জন্য। ভাত বেটে সূক্ষ্ম চালনি দিয়ে চেলে তার সাথে পানি মিশিয়ে মোড়া মোড়া সুতা তাতে ভিজায়। ভিজা সুতা চড়কাতে চড়িয়ে চড়কা ঘুরানোর প্রয়োজন হয়। এক হাতে চড়কা ঘুরিয়ে একটা একটা ভেজা সুতার ভাজ খোলে আর এক হাতে একটা একটা ভেজা সুতার ভাজ নাড়াড় মধ্যে পাকাতে থাকে। নাড়ার মধ্যে এই ভাতানো সুতা এক ঘণ্টা রোদে শুকানোরপর সেটা পডিতে পাঠানো হয়। একজন মালিকের পাঁচটা দশটা থেকে শুরু করে একশত দেড়শত জামদানি তাত নিয়ে যেটুকু জমি সেটাই পডি বা বাংলা।

ভাতানো শুকনা সুতার মোড়া পডিতে এনে ছোট চড়কিতে বসিয়ে হাত আর পায়ের ব্যবহার করে প্রতিটা সুতা যত্ন নিয়ে একটা থেকে আরেকটা আলাদা করে হোলার তৈরি ছাড়াতে ভরা হয়। খালি ছাডাতে সুতা ভরার সাথে সাথে তার নাম হয়ে যায় মউরা। মউরাকে মাক্কুর ভেতরে ঢুকানোর পর প্রস্তুত হল জামদানির বাইনের সুতা। যেটা তাঁতের প্রস্থে থাকে।

এবার শুরু তানার সুতা। সুতার মোড়া উপরে রেখে দুজন কারিগর হানায় (সানা) কাজ করে। হানার দুই পাশে দুই জন কারিগর বসে। একেকটা হানা (সানা) জামদানি তাঁতের সমানই লম্বা। চিরুনির মত দাঁতওয়ালা। তবে চিরুনির মত এক পাশে দাঁত খোলা না, দুই পাশই বন্ধ এবং মাঝখানে চিরুনির দাঁতের মত দাঁত। একজন কারিগর একপাশ থেকে হানার (সানা) একেকটা দাঁতে একটা করে সুতা চারটা থেকে পাঁচটা পেচ দিয়ে অন্য পাশে বসে থাকা কারিগরের হাতে দেয় এবং সে সেই একটা সুতা টেনে ঘরে বসে থাকে। অন্য পাশ থেকে দশটা থেকে পনেরোটা সুতা আসা পর্যন্ত সে ওভাবেই টেনে ধরে রাখে। পনেরোটা সুতা নিশ্চিত হলে সেগুলো একসাথে গিট দেয়। একটা একটা সুতা দিয়ে এভাবেই দুইজন কারিগর টানা পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে একটা হানা সুতা দিয়ে সম্পূর্ণ ভরতে পারে। হানায় এই সুতা ভরাকে বলা হয় হানায় 'ব' ভরা। গিট দেয়া প্রান্তটা হানার সুতার শুরু। এই শুরুটা নরদে পেটানো হয়। সুতা আলাদা আলাদা দাঁতে বসিয়ে সুতার মোড়া টানে, সুতা লম্বা হয় আর নরদে পেঁচানো হয়। এই এক হানা (সানা) দিয়ে চারটা করে শাড়ি বোনা সম্ভব। দুইজন কারিগর জরুরী চুক্তিতে একদিনে সর্বোচ্চ চারটা হানায় 'ব' ভরতে পারে। হানায় 'ব' ভরার এই পদ্ধতিটা বসে করতে হয়। এটা "তানা আডা" নামে আরেক পদ্ধতিতেও করা সম্ভব। একজন হানায় পেচানো কাপড় কোমরে বেধে টান দিয়ে ধরে রাখে আরেকজন একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে হেটে হেটে 'ব' ভরে আর নরদে পেচায়। তৈরি জামদানির তানার সুতা যেটা তাঁতের দৈর্ঘ্যে থাকে।

নরদে পেঁচানো এই তানার সুতা পডিতে এনে তাঁতে সেট করার কাজ শুরু মানে আরেক সংগ্রাম। নরদ তাঁতের পেছনের দিকে বসিয়ে তানার সুতার সাথে মালসি সেট করে তার সামনে দক্তি রাখে সেই দক্তির ভেতর থাকে হানা। হানা ভরা দক্তির সামনের দিকে সুতা টেনে সামনের নরদের সাথে আটকায়। তাঁতের চৌচাল থেকে নেমে আসা নাচনি দড়ি আর নাচনি কাডি বা পুডুল কাডি মালসির সাথে বেধে নাচানোর জন্য তৈরি করা হয়। সাথে তাল দেয়ার জন্য আরও থাকে বিগ হাতায় পায়ের নিচে তল পাওয়ার আর জুইতাস। চৌচাল থেকে একটু নিচে কাঠিতে থাকে রঙিন সুতার ববিন। সামনের নরদের সাথে শক্তি হিসেবে থাকে মুনি। তাঁতের চারপাশে ঘোড়ার খুডা, বিস কড়ম খুডা, মুনির খুডা, মুতি কাডা, মুতি কামানি, লোহার খিলির মতো নানান ধরনের খুডা ব্যবহার করা হয় তাঁতকে টান রাখার জন্য। শাড়ীতে যে ডিজাইন হবে তার সাথে কালার মিলিয়ে শাড়ির পাড়ের জন্য যত রঙের যতটা সুতা লাগবে ঠিক ততটা সুতা আলাদাভাবে শাড়ির দুই পাশে রেখে পাড়ের সুতাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির আরেক প্রান্তে ইট বেধে ঝুলিয়ে টান করে রাখে যেন সুতা এলোমেলো হয়ে না যায়। দুইজন তাঁতি কাপড় বোনে। ডানপাশে বসে তাঁতি বামপাশে বসে সাগরেদ। ডান পাশের জন ডান থেকে বায়ে বাম পাশের জন্য বাম থেকে ডানে নকশার কাজ করে। মাঝখানে এসে দুজনেই থামে তারপরই দক্তির সামনের ফাকা জায়গা দিয়ে মউরা ভরা মাক্কু ডান থেকে বামে আবার বাম থেকে ডানে এক কারিগর আরেক কাগিরগরকে ঠেলে দেয় যেটা দিয়ে বাইনের সুতা দেয়া হল, বাইনের আলগা সুতাটাকে তানার সুতার সাথে দক্তি দিয়ে সামনের দিকে টান দিলেই শাড়ি তৈরি শুরু। দক্তির এক টানে মাক্কু দিয়ে ভরা দুইটা সুতা একসাথে হয়ে এক বাইন হয়। তারপর ঐ এক বাইনের সুতায় কাডুল দিয়ে এক প্রস্থে সুতার নকশা করে তাতিরা। এক প্রস্থ নকশা শেষ হলে আবার মাকু দিয়ে ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে দুবার সুতা দিয়ে দপ্তি টানলে এক বাইন হল। সেই বাইনে আবার এক প্রস্থ নকশা করে। দুই সুতায় এক নকশা, মাক্কু দেয়া, আবার দক্তির টান আবার দুই সুতায় এক নকশা...এভাবেই চলতে থাকে। এক হাত পরিমাণ শাড়ি বোনা হলে তাতে খলান দেয়া হয়। ফ্যানের বাতাসে খলান শুকালে মুনিতে চাপ দিয়ে এক হাত শাড়ি টুকু সামনের নরদে পেঁচানো হয়। তারপর আবার মাক্কু ভরা, দক্তির টান, দুই সুতার উপর এক প্রস্থ নকশা আবার মাক্কু। চলতেই থাকে একদিন, দুইদিন, তিনদিন... বাইনের উপরেই নির্ভর করে একেকটা শাড়ি তৈরির সময় কাল। বাইন পাতলা হলে এক শাড়ি তৈরি করতে এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে বাইন ঘন হলে এক শাড়িতেই ছয় মাস সময়ও লেগে যায়।

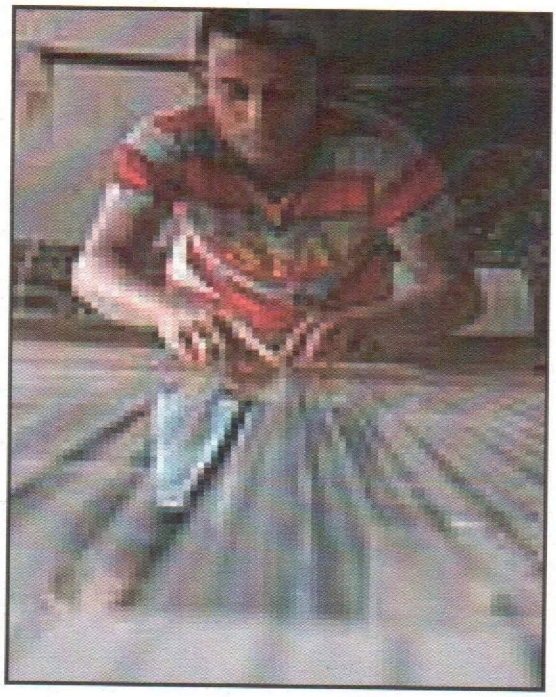

রেশমি গুটি থেকে প্রস্তুত সুতা মূল শাড়ি প্রস্তুতের জন্য তাতে সাজানো হয়

গুটি থেকে প্রস্তুত সুতা রঙ করা হয়

রঙ করা সুতা বোনার জন্য প্রস্তুত করা হয়

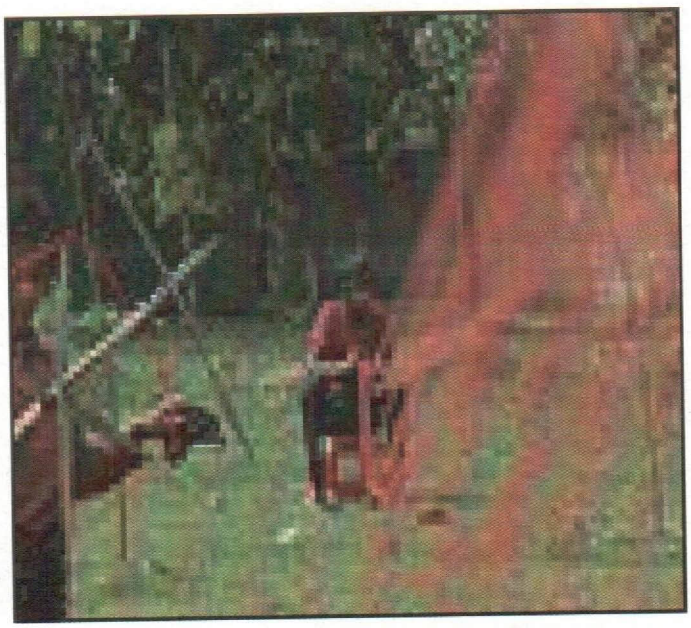

সুতাকে শক্ত করার জন্য কয়েক ধাপে ভাতের মাড় দিয়ে শুকানো হয়

রোদে শুকানো সুতা তাতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়

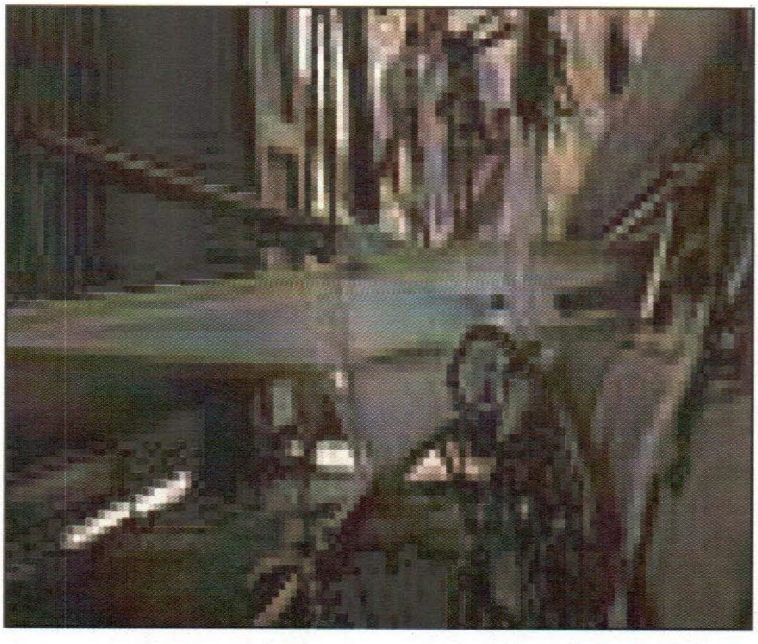

সাধারণ হাত তাঁতে মূল শাড়ি রেখে তাতে রঙিন সুতা দিয়ে নকশা করা হয়

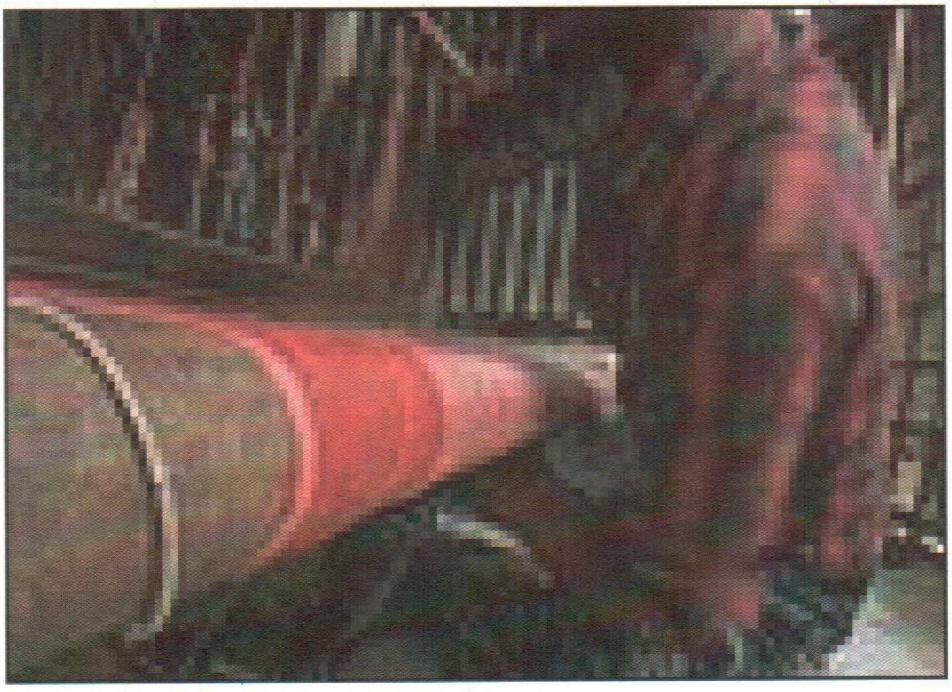

নকশা করার সময় আরো একবার ভাতের মাড় দেয়া হয়

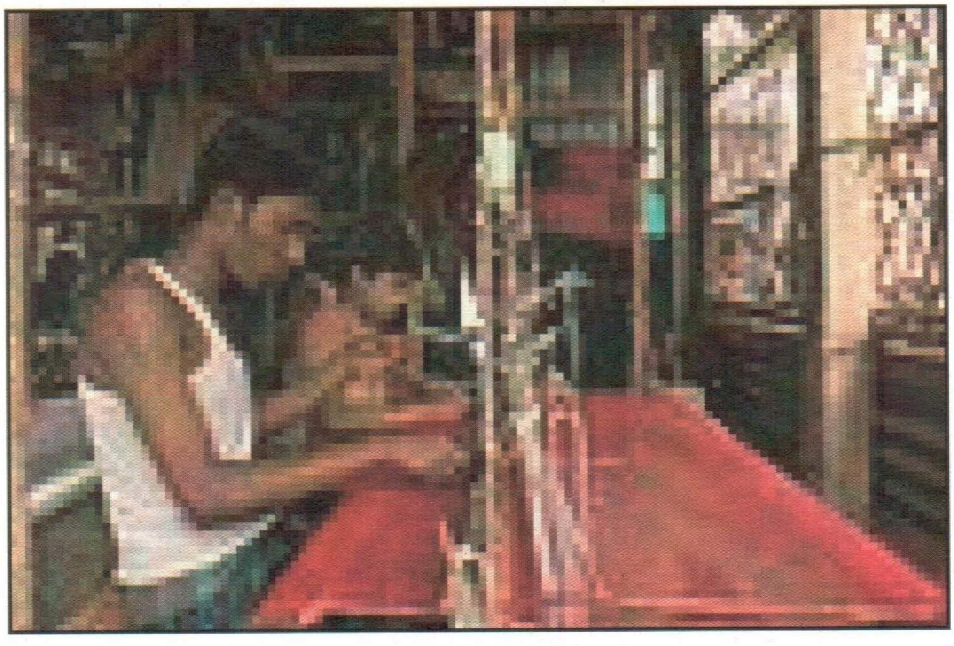

তারপর শাড়িতে নকশা তোলা শুরু হয়

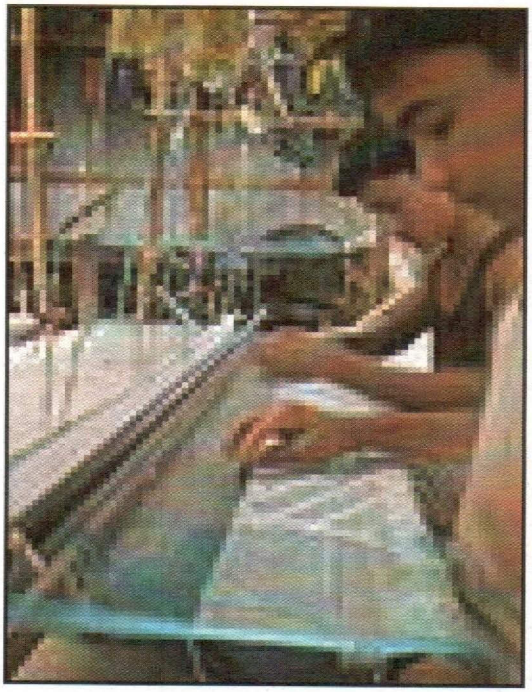

রকমারি রঙের সুতা আর নকশায় শাড়ি সাজানো হয়

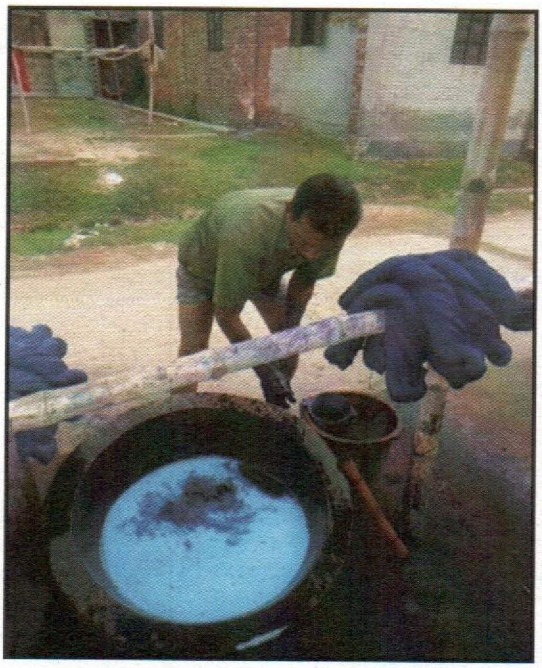

বাইনের সুতা রঙকরণ

ভাতানো বাইনের সুতা চড়কা থেকে নাডাতে পাকানোর পর রোদে শুকানো হচ্ছে

চড়কি থেকে সুতা ছাডাতে ভরা হচ্ছে

বাইনের সুতা ভরা মউরা

মউরা ভরা মাক্কু

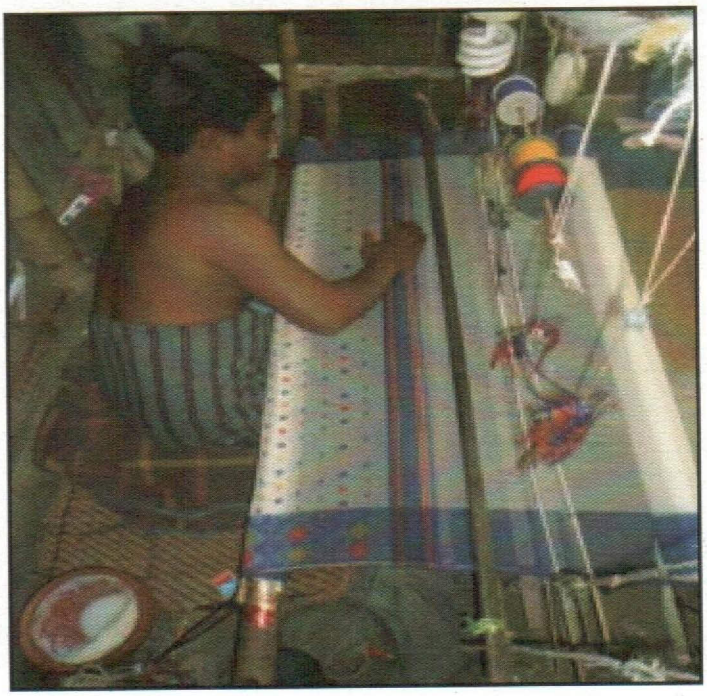

শাড়িতে খলান দেয়া হচ্ছে

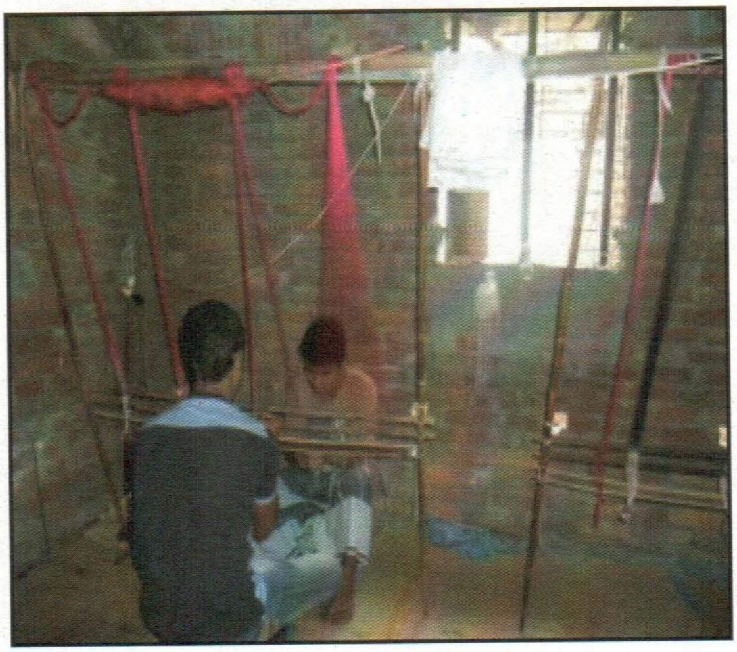

তানার সুতা

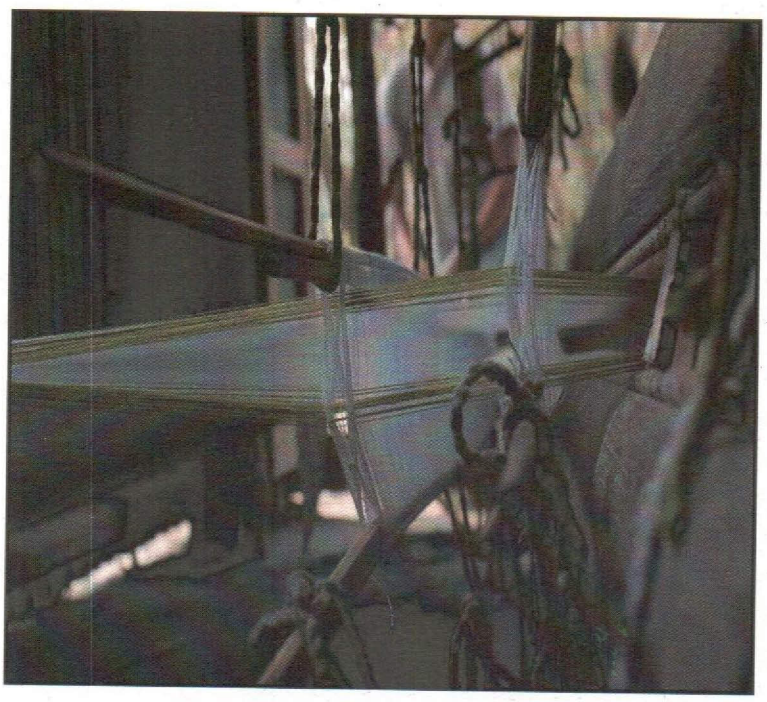

দুই প্রস্ত তানার সুতার মাঝখান দিয়েই মাক্কু চালনা করা হয়

নানান রঙের বাইনের সুতার মোড়া

জামদানী তাঁত বুননের যন্ত্রের বর্ণনা

সম্পূর্ণ বাঁশ ও কাঠের তৈরি জামদানী তৈরির যন্ত্রটি ৬০ ইঞ্চি লম্বা ও ২৫ ইঞ্চি চওড়া। প্রতিটি যন্ত্র স্থাপনের জন্য ১২ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। এই যন্ত্র স্থাপন করে সমতল পৃষ্ঠ থেকে ২ ফুট নিচে গর্ত করতে হয় যাতে কাজের উপযোগী হয়। যন্ত্রটি নিম্নোক্ত উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়-

১) চৌচালা, ২) অহি, ৩) দকতি, ৪) কোলের নরদ, ৫) বাইনের নরদ, ৬) বাবারি, ৭) বিসকুম কোড়া, ৮) আইলনা মালসি, ৯) পুতুল কাঠি, ১০) তল পাওয়ার, ১১) গোড়া খুঁটা, ১২) পাইহা, ১৩) খিলি, ১৪) মাকরু, ১৫) (লোহার তৈরি) কানরুল, ১৬) সানা, ১৭) নাছনি কাঠি ইত্যাদি।

কয়েকটি জামদানী শাড়ির পরিচিত ডিজাইন

- করল্লা পাড়
- জমিনে জুঁই ফুল
- কলকা পাড়া
- জমিনে শাপলা ফুল
- ডালিম পাড়
- জমিনে সন্দেশ ফুল
- শামুক পাড়
- জমিনে শামুক তেছড়ি নকশা
- বেলপাতা পাড়
- জমিনে আকাশি ফুল
- কচু পাতা পাড়
- জমিনে করাত তেছড়ি নকশা
- পুই লতা পাড়া
- জমিনে বাইমা তেছড়ি নকশা
- কলার ফানা
- আদার ফানা
- আংটি জাল বা হানসা
- কলমি লতা
- শাপলা ফুল
- দুবলা জাল
- ময়ুর পঙ্খি
- কচু পাতা তেছড়ি
- তারা ফুল
- গোলাপ ফুল
- বেলী ফুল
- ঝুমকা ফুল
- চালতা ফুল
- মুরালি লতা
- প্রজাপতি বুটি ইত্যাদি।

জামদানি শাড়ির জনপ্রিয় কিছু পাড়ের নাম

- বাদুর পাখি পাড়
- বেল পাতা পাড়
- মিহি পাড়
- গিলা পাড়
- কাউয়ার ঠ্যাং পাড়
- ইঞ্চি পাড়
- শালগম পাড়
- আঙ্গুরফুল পাড়
- কলকা পাড়
- কাচি পাড় ইত্যাদি।

ট) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ** ঃ SGS Bangladesh Limited, ১১০ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, নূর টাওয়ার, ঢাকা-১২০৫ বাংলাদেশ পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ এই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের গুণগতমান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা পূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

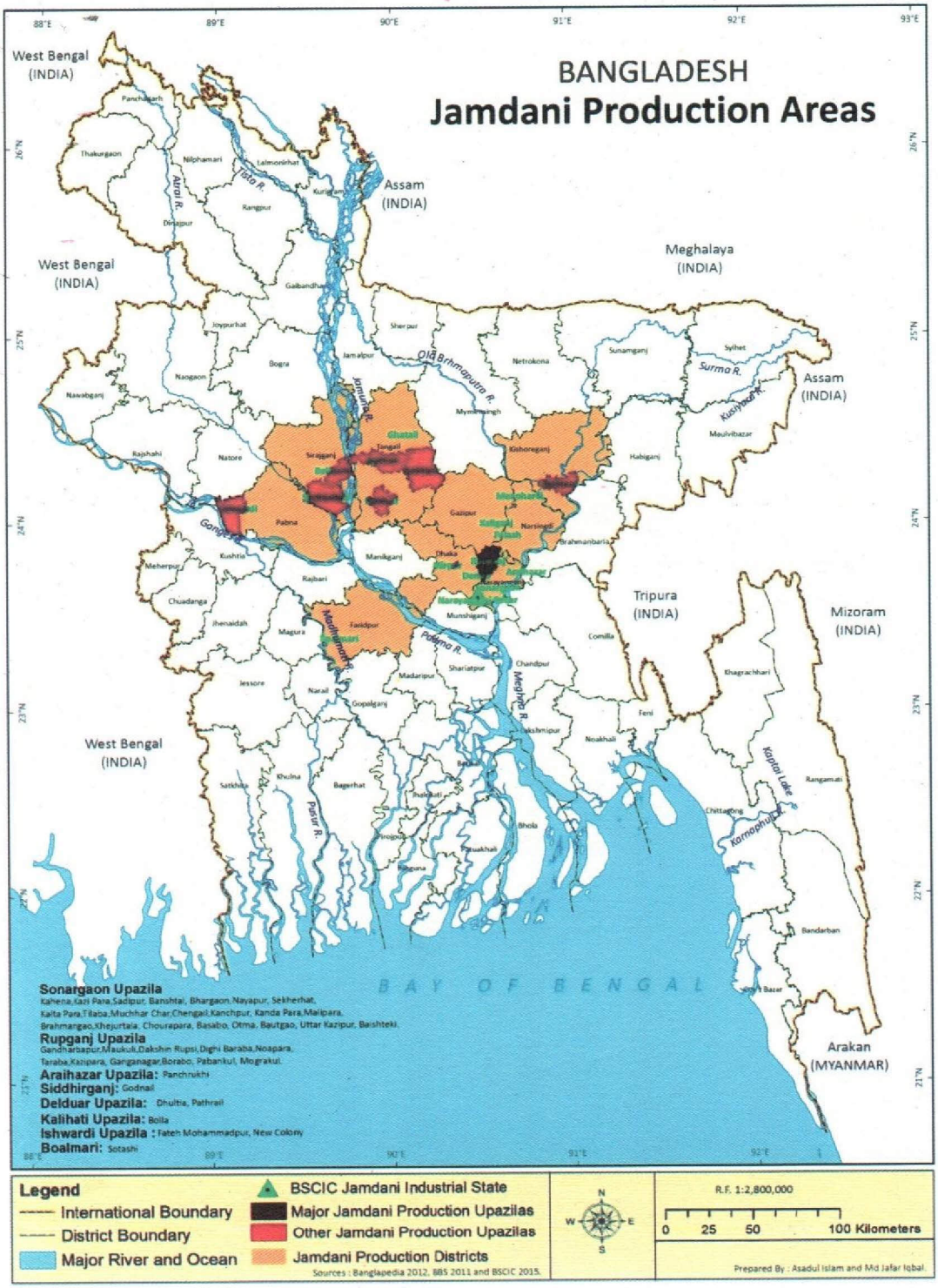

BANGLADESH
Jamdani Production Areas
West Bengal (INDIA)
Assam (INDIA)
Meghalaya (INDIA)
Tripura (INDIA)
Mizoram (INDIA)
Arakan (MYANMAR)
BAY OF BENGAL
Sonargaon Upazila
Kahena,Kazi Para,Sadipur, Banshtal, Bhargaon,Nayapur, Sekherhat,
Kalta Para,Tilaba,Muchhar Char,Chengail,Kanchpur, Kanda Para,Malipara,
Brahmangao,Khejurtala, Chourapara, Basabo, Otma, Bautgao, Uttar Kazipur, Baishteki.
Rupganj Upazila
Gandharbapur,Maukuli,Dakshin Rupsi,Dighi Baraba,Noapara,
Taraba,Kazipara, Ganganagar,Borabo, Pabankul, Mograkul.
Araihazar Upazila: Panchrukhi
Siddhirganj: Godnail
Delduar Upazila: Dhultia, Pathrail
Kalihati Upazila: Bolla
Ishwardi Upazila : Fateh Mohammadpur, New Colony
Boalmari: Sotashi
Legend
International Boundary
District Boundary
Major River and Ocean
BSCIC Jamdani Industrial State
Major Jamdani Production Upazilas
Other Jamdani Production Upazilas
Jamdani Production Districts
Sources : Banglapedia 2012, BBS 2011 and BSCIC 2015.
R.F. 1:2,800,000
0 25 50 100 Kilometers
Prepared By : Asadul Islam and Md Jafar Iqbal.

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate
   157, Government New Market, Dhaka
2. Messrs Warshi Book Corporation
   14 Bangabandhu Avenue, Dhaka
3. Bangladesh Co-operative Book Society
   150, Government New Market, Dhaka
4. Messrs K.R. & Co.
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka
5. Bangladesh Subscription Service
   64, Purana Paltan, Dhaka
6. Messrs Mohiuddin & Sons
   143, Government New Market, Dhaka
7. Messrs Hassnat Library
   4, N. S. Road, Kushtia
8. Messrs Current Book Stall
   Jessore Road, Khulna
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal
    15, Bangla Bazar, Dhaka
11. Messrs New Front Bipani Bitan
    New Market, Chittagong

Govt. Printing Press—Process Section—1950/15-16/Ind.—12-06-2016—200 Books

Printed by: Dr. Mohiuddin Ahmed, Deputy Director
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka-1208.
Published by: Md. Alamgir Hossain, Deputy Director,
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.